Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 158–170
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের কাহিনি বিন্যাস : একটি পর্যালোচনা

ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
ই-মেইল: sourav.2347@gmail.com

Keyword
ছোটগল্প, কাহিনি বিন্যাস, আকার ও আয়তন, উপন্যাসোপম, দৃষ্টিকোণ, চিঠি, কবিতা, গান, চিত্রনাট্যধর্মী

Abstract
অভিজিৎ সেনের গল্পে ফুটে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের জীবনকথা, জমি ও জমি সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক—অর্থাৎ ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন বেছে নিয়েছেন চলমান সময়, ক্রমপরিবর্তমান সমাজ ও মানুষের জীবনের বহুবিধ আপাত অনাবিষ্কৃত দিক। কালের প্রবহমানতায় অভিজিৎ সেন ব্যক্তিজীবনে, আত্মগত দর্শনে যেমন বহুবার নিজেকে ভেঙেছেন, ঠিক তেমনই কালের নিয়মেই তাঁর রচিত ছোটগল্পে এসেছে বহু পরিবর্তন। আপাতভাবে খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই, লেখালিখির শুরুর পর্বে অভিজিৎ সেন জমি ও জমি কেন্দ্রিকতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোটগল্প রচনায় নিমগ্ন থেকেছেন। অতঃপর, দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বহুলাংশে হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়, পাশাপাশি নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রেম ও যৌনতার নিরিখে বিচার করে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী থেকেছেন লেখক।

ব্যক্তিজীবন ও চাকরিসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বহুধাবিস্তৃত অঞ্চলে লেখকের যাতাযাত, বসবাস, মানুষ জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে মেলামেশা, অঞ্চলভেদে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভিন্নতা, অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত লোককথা-উপকথার প্রতি লেখকের অদম্য টানের পরিচয় ক্ষেত্রবিশেষে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা'য় রূপান্তরিত হয়েই জন্ম দিয়েছে একাধিক ছোটগল্পের।

আসলে পঞ্চাশ ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে বহুবিধ যেসমস্ত 'আন্দোলন' চলেছিল সেখানে বাস্তবের, বলা ভালো জান্তব কোনো পরিস্থিতি বা রক্ত মাংসের মানুষের, অনাবিল প্রকৃতির, বাস্তবের সঙ্গে চরিত্রের ও ঘটনার সাযুজ্যের অভাব ছিল। সত্তর দশক থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই হোক, অথবা বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানে চাকরি সূত্রে, বহু শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মূল শহর কলকাতা থেকে দূরবর্তী কোনো মফঃস্বল অথবা গ্রামের দিকে স্থানান্তরিত হন। নাগরিক ক্লান্তিকে ভুলে, নাগরিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে গ্রাম ও গ্রামজীবন সম্পর্কে নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতা আহরণ করতে থাকেন তাঁরা। ফলে স্বভাবতই এঁদের গল্পে স্থান পায় সময়ের, ইতিহাসের, জীবনের বহুবিধ কোলাজ, রিপোর্টিং-এর ভঙ্গি, প্রচলিত লোককথা, মিথ ও পুরাণের অনুষঙ্গ, স্থান-কাল ও পাত্রের পারস্পরিক সংলগ্নতা ইত্যাদি। স্বভাবতই ছোটগল্পে সেইসময় ফিরে আসতে শুরু করে একরকমের গল্পের আবহ ও আমেজ। অভিজিৎ সেন এই ধারাকে পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িকদের প্রভাবে যেমন, ঠিক তেমনই নিজস্ব সাহিত্যবোধে আত্তীকরণ করেছেন।

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প বহুবিধ বিন্যাসে আলোচনা যোগ্য। আমরা আমাদের মূল প্রবন্ধে অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের কাহিনি বিন্যাসের শিল্পতাৎপর্যমণ্ডিত দিকটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

Discussion

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পগুলির যে একটি মূল বৈশিষ্ট্য শুরুতেই আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো, লেখকের অধিকাংশ ছোটগল্পই আয়তনে বেশ সুদীর্ঘ, অনেকাংশে উপন্যাসোপম। লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়—

> *"আমার লেখার বেশি অংশই আমাদের গ্রামাঞ্চল অথবা মফস্বল শহরের মানুষকে নিয়ে, আমার চরিত্রের প্রায় সবাইই জমি আশ্রয়ী মানুষ। আর এই জমি আশ্রয়ী মানুষকে শাসন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের পরিষেবা, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত কিছু মানুষ। জমি শাসন জমির শোষণ জমির বিভিন্ন স্বত্ব, কৃষি আশ্রয়ী মানুষের যাবতীয় বোধ বিশ্বাস, আবেগ অনুভূতি, আপোষ-লড়াই, ইতিহাস-কিংবদন্তি এইসব ব্যাপারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আমার প্রায় অন্তত একশোটি গল্প উপন্যাসে আছে।"* [১]

ফলে স্বভাবতই গল্পগুলি ভরে ও ভারে অনেকাংশে সুদীর্ঘ। ঠিক এই কারণেই অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী', 'বর্গক্ষেত্র'-কে অনেকে ছোটগল্পের বদলে উপন্যাস বলেই মানতে চান। যদিও 'দেবাংশী' বা 'বর্গক্ষেত্র' লেখকের সাহিত্য পর্বের শুরুর দিকে লেখা, তবুও কাহিনির দীর্ঘতা, লেখকের পরবর্তী গল্পগুলিতেও সমানভাবে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ 'কলাপাতা', 'মানব দেহের গৌরব', 'দীঘি' ইত্যাদি গল্পের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের কাহিনির এই দীর্ঘতার কারণ, ছোটগল্পের একমুখিনতা সর্বত্র রক্ষিত হয় নি, বহু ছোটগল্পেই এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা মতাদর্শ পরিস্ফুট করা হয়েছে সুচারুভাবে। আর নির্দিষ্ট কোনো শব্দবন্ধের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে ছোটগল্প রচনায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করেছেন অভিজিৎ সেন। প্লট, সাবপ্লট, বহুবিধ চরিত্র, অনপুঙ্খ বর্ণনা ইত্যাদি যোগে লেখকের বহু ছোটগল্পই কোনো একটি ক্ষণিক সময়ের বদলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধরে রেখেছে এক দীর্ঘ সময়কে, এক দীর্ঘ জীবনকে। একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের উত্থান-পতনে অভিজিৎ সেন বিস্তারিত করেছেন সেই চরিত্রের কয়েকটি প্রজন্মকে। লেখকের নিজের বক্তব্য—

> *"ইদানিং আমি আমার গল্পের মধ্যে কিছু 'গল্প'-ও রাখতে চাই। লক্ষ করেছি সাধারণ পাঠকের গল্প পড়ার ঝোঁক বেশ কিছুটা কমে গেছে। এর একটা প্রধান কারণ বাংলা আধুনিক গল্পে 'গল্প'-এর আকর্ষণ কমে গিয়ে একধরনের মস্তিষ্কের ব্যায়ামচর্চার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।"* [২]

উদাহরণস্বরূপ 'দেবাংশী', 'বর্গক্ষেত্র', 'আইন শৃঙ্খলা', 'মানব দেহের গৌরব', 'দীঘি', 'কলাপাতা' ইত্যাদি গল্পের উল্লেখ করতে পারি। 'দেবাংশী', 'বর্গক্ষেত্র' ও 'দীঘি' একাধিক প্রজন্মের চরিত্রের সমণ্বয়ে তার নির্দিষ্ট অন্তিমে পৌঁছেছে।

'দেবাংশী' গল্পে তাই কেবল ব্যক্তিসত্তার লোকবিশ্বাসে আরোপিত দেবাংশী সত্তাটির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিক ট্রাজেডি পরিবেশিত হয়নি। আবার কেবলমাত্র লোকাচার-লোকবিশ্বাসে বিশ্বাসী নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর তথা নির্দিষ্ট ভূমণ্ডলের কোনো কৌম জীবনের কাহিনিও একপেশে ভাবে বর্ণিত হয়নি, নিজ বক্তব্যকে ও মতাদর্শকে স্থিত রাখতে শ্রেণিসংগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় মাত্রাটিও যুক্ত করেছেন লেখক। আর তাই গল্প যখন পূর্ণবয়স্ক সারবান লোহারকে দিয়ে শুরু হয়, তখন লেখক সুকৌশলে 'দেবাংশী'-র আড়ালে সারবান লোহারের ব্যক্তিপরিচয়কেও তুলে আনেন। বলা যেতে পারে, শিশু সারবান থেকে পরিণত সারবান হয়ে পৌঁছনোর সেই দীর্ঘ যাত্রাপথকেও লেখক হাজির করেন গল্পের মধ্যে। তেমনই শুধুমাত্র কৌম জীবনের ঘটনা বা শুধুমাত্র লোকবিশ্বাসের ঘটনাকে প্রাধান্য দিলে 'দেবাংশী'-র পরিণত হয়তো অন্যরকম হতো। সাধারণ রোগ-অসুখ বা—

> *"যক্ষ্মা, হাঁপানি, কুষ্ঠর মতো রোগও সে মাটি-ধোয়া জল খেলে সেরে যাবে, বন্ধ্যা রমণী সন্তানবতী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো, বৃক্ষলতা সব দেখবে, বুজে যাওয়া পুষ্করিণী-জলে মাছে কেলি করবে, বাঁজা গাই রাত দুপুরে ডাক তুলবে পাড়া কাঁপিয়ে, যে গাইয়ের বাছুর মরে দুধের অভাবে তার মরা ওলানে দুধের বান ডাকবে। সাপ, বিছা, ভূত-প্রেত, মাদার আর জিনের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে কোলের*

> *শিশু, পোয়াতি স্ত্রী লোক। মায় যে সব লাউ-কুমড়ো-সিম ঝাঁকায় কেবল জালি আসে আর ঝড়ে মরে যায় সে-সব গাছও ফলভারে ঝাঁকা ভেঙে ফেলতে চাইবে।'*[৩]

এইসব প্রতিকারের বন্দোবস্তের মধ্যে গল্প অন্যদিকে চালিত হতে পারত, কিন্তু সেতু বর্মণের আবির্ভাব এবং দেবাংশীর কাছে তার প্রতিকার চাওয়া, গল্পকে অন্য পথে চালিত করে। আবার এই গল্পেই দৈত্যারির মৃত্যুর পরে তার পুত্র বিনোদের আবির্ভাব গল্পে নতুন মোড় এনে দেয়। গল্পে রোহিণী-জাফরের জমি সংক্রান্ত মামলাটি উপকাহিনির মতো থাকলেও তার গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়, কোনো অংশে কম নয় দেবাংশী সারবান লোহারের তার স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃত আলাপের মুহূর্তটিও। আর ঠিক এ সমস্ত কিছুর হাত ধরে গল্পে আসে বারুণীবালা। ফলে একাধিক চরিত্র, একটি চরিত্রের বহুমুখী অস্তিত্ব, একাধিক উপকাহিনি, একাধিক সম্ভাবনা পেরিয়ে গল্পের একেবারে অন্তিমে, ধর্ষিতা বারুণীবালাকে আশ্রয় করে গল্প যে খেরা খেলার অঙ্গনে, যে থানের গণ্ডিতে শুরু হয়েছিল সেই গণ্ডিতে এসেই শেষ হয়।

ঠিক এই ছবি অন্যরকম ভাবে আমরা দেখতে পাই 'বর্গক্ষেত্র' গল্পে। জমি ব্যবস্থার চিরাচরিত প্রথাটিকে বোঝানোর জন্যই কয়েক পুরুষের বৃত্তান্ত অভিজিৎ সেন তুলে ধরেন। 'মাল' সম্প্রদায়কে গল্পে উপস্থাপিত করতে পরপর ডাফা মাল, আস্তিক মাল, পরশুরাম মাল হাজির হয় গল্পে। এমনকি জোতদারদের বংশানুক্রমিক ধারাটিকে স্পষ্ট করার জন্য শচীকান্তের পাশাপাশি তার পুত্র বিনয়কেও গল্পে হাজির করেন লেখক। এমনকি এই গল্পেই সেটেলমেন্ট অফিসার থেকে শুরু করে শচীকান্তের জমি কেনা রাখাল, সুরক্ষাকর্তা রূপে পুলিশ, পুলিশের ধর্ষকাম মনোভাবের শিকার সারি, খল চরিত্রের সুশীলা সহ একাধিক উপচরিত্র এই গল্পে একই সঙ্গে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সু ও আদর্শবান রাজনৈতিক কর্মীমণ্ডলীর একাধিক চরিত্র। বহু চরিত্রময় এই গল্পে তাই স্বাভাবিক ভাবে একাধিক উপকাহিনিও গড়ে উঠে গল্পের আয়তনকে সহজেই উপন্যাসোপম করে তুলেছে। 'বর্গক্ষেত্র' নামকরণের মধ্যেই 'বর্গা ব্যবস্থা' অভিধাটি লুকিয়ে থাকে আর অন্তিমে তা স্পষ্ট হয়। বলা যেতে পারে, 'বর্গক্ষেত্র' গল্প তাই তৎকালীন বর্গা ব্যবস্থার এক সাহিত্যিক দলিল হয়ে ওঠে। গণসংগ্রামের ও গণপ্রতিরোধের বার্তাকে তুলে ধরতে পরশুরাম প্রাক পৌরাণিক বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয় বিনাশকারী যে পরশুরামের অস্তিত্ব আবহমান কাল ধরে সমাজে জারিত, সেই পরশুরামই যেন 'বর্গক্ষেত্র' গল্পে জোতদার বিনাশের শপথ গ্রহণ করে।

শুধুমাত্র শ্রেণিসংগ্রামের এই অভিধাই অভিজিৎ সেনের গল্পগুলিকে উপন্যাসোপম করে তুলেছে তাই একমাত্র নয়, নর-নারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও, বলা ভালো অনাবিষ্কৃত সে সব সম্পর্কের দিক নির্ণয়েও অভিজিৎ সেনের গল্প 'মানবদেহের গৌরব' দীর্ঘ কাহিনি-উপকাহিনির সংমিশ্রণে তার পরিণত ও সুস্থিত আকার লাভ করেছে। বিধবা মিলন ও তার মেয়ে সুলেখার কলহ মুখর পরিস্থিতি দিয়ে এই গল্প শুরু হলেও শেষপর্যন্ত গল্পের পরিণতি হতবাক করে দেয় আমাদের। বস্তুত এই গল্পেও মিলনের 'বিধবা' হয়ে ওঠার ঘটনা এক দীর্ঘ আখ্যানে পরিণত রূপ পেয়েছে। মিলনের দীর্ঘ বাইশ বছরের লড়াই বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। ঠিক তেমনই সুলেখার জীবনেও পরপর পুরুষের আগমন যে প্রেক্ষিতে ঘটেছে, তার পিছনেও লুকিয়ে থাকে এক দীর্ঘ ইতিহাস। 'মানবদেহের গৌরব' বলতে সাধারণত, যৌন আবেদন সহ 'দেহভাণ্ড'-কে বোঝানো হয়, সেই ধারণাকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আঁচড়ে এঁকেছেন অভিজিৎ সেন। ঘাত-প্রতিঘাতের মতো এই গল্পেও মিলন ও সুলেখাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। আর তাই শেষপর্যন্ত এই গল্পের পরিণতিও বহু দীর্ঘতাকে পেরিয়ে এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে, বলা ভালো আছড়ে পড়েছে।

গ্রাম-সমাজ ও মফঃস্বলের বহু পেশার, বিবিধ ধর্মের মানুষের আনাগোনা অভিজিৎ সেনের গল্পে প্রায়শই লক্ষ করা যায়। অভিজিৎ সেনের গল্পের মূল চরিত্র অনেকাংশে গ্রাম ও মফঃস্বলের বাসিন্দা। ক্ষেত্রসমীক্ষাকে গল্পে ঠাঁই দিতে গিয়ে অনেকাংশেই অভিজিৎ সেন কোনো কোনো গল্পের মূল চরিত্র হয়ে ওঠেন। গল্প এগিয়ে চলে উত্তম পুরুষের কথন রীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেনের স্ব-বিরোধী বক্তব্য—

> *"নিজেকে নিয়ে লেখা মানেই তো 'আমি'। এই অহংকে এড়াবার কোন উপায় নেই, অথচ এড়াতে তো প্রাণপণেই চাই। এই কারণেই পারতপক্ষে উত্তম পুরুষে কোন লেখা লিখি না। কেন লিখি, এ নিয়ে কোন তত্ত্ব খাড়া করি না কখনো।'*[৪]

যদিও আমরা দেখতে পেয়েছি, অভিজিৎ সেনের বহু গল্পই এই উত্তম পুরুষের কথন রীতিতে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে 'ঋষির শ্রাদ্ধ', 'চিলানি মায়ের গল্প', 'স্ফিংকস', 'সাইদার এখন-তখন', 'মানুষের সম্পর্ক', 'নদীর মধ্যে শহর', 'ফাল্গুনি রাতের পালা', 'আটশো বছর আগের একদিন', 'মানুষের রেখাচিত্র', 'লখিন্দর ফিরে আসবে', 'কলাপাতা', 'শিলালিপি-তাম্রশাসন', 'কাক', 'তৃতীয় প্রেমিক' ইত্যাদি গল্প উল্লেখযোগ্য। যদিও উত্তম পুরুষের বয়ানে লেখা এই সমস্ত গল্পগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের 'আমি' চরিত্রটি গল্পের মূল চরিত্র নয়। গল্পের মধ্যে থেকেও গল্পকথক একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করেন সেখানে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের বদলে এই সমস্ত গল্পগুলিতে 'আমি'র অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন গল্পকথকের ভূমিকা নিয়েছে মাত্র।

উত্তম পুরুষের বয়ানে লেখা বেশকিছু গল্পে আবার দুজন বক্তার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে অনেক সময়। 'স্ফিংকস', 'মানুষের সম্পর্ক', 'লখিন্দর ফিরে আসবে'—এই গল্পগুলিতে দুজন উত্তম পুরুষের বক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বর্ণিত হয়েছে।

'স্ফিংকস' গল্পে সুরঞ্জন ও আমাতীর কাহিনিকে গল্পটির মূল ভরকেন্দ্র হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি। যেখানে গল্প শুরু হওয়ার সময় যে কথককে, অর্থাৎ যে উত্তম পুরুষের 'আমি' কে আমরা গল্প উপস্থাপক হিসেবে পাই, পরবর্তীকালে গল্প উপস্থাপক হিসেবে আমরা আর তাকে না পেয়ে বরং খুঁজে পাই সুরঞ্জনকে। 'স্ফিংকস' তাই শুরু হয় এইভাবে—

> *"এমন একটা জায়গায় সুরঞ্জনের সঙ্গে এত বছর পরে আবার দেখা হবে, ভাবিনি। আমার ভায়রা নির্মল ডি ভি সি-র ইঞ্জিনিয়ার। বেশ বড়সড় অফিসার।..."* [৫]

আর তারপর গল্পের মধ্যে সুরঞ্জন নতুন গল্প বা মূল গল্প শুরু করে এইভাবে—

> *"সোজা হয়ে বসে সুরঞ্জন বলল, আমি জানি তোমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। এতদিন পরে এই বয়সে বলতেও আমার আর কোনও আপত্তি নেই। তবে শোনো।"* [৬]

এইভাবে উত্তম পুরুষের 'আমি'কে বর্জন করে, পুরো গল্পটি হয়ে ওঠে সুরঞ্জনের বক্তব্য এবং একেবারে শেষে আমরা আবার খুঁজে পাই গল্প শুরুর কথককে—

> *"সুরঞ্জন তার কথা বন্ধ করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি উঠে যন্ত্রটার কাছে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্যাসেটটা বের করে যথাস্থানে রাখলাম। পাশেই গোয়াল পাড়ার গানের আর একটা ক্যাসেট ছিল। আমি সেই ক্যাসেটখানা যন্ত্রে চাপালাম।..."* [৭]

অর্থাৎ, গল্পের প্রথমে এবং শুরুতে গল্প কথকের ভূমিকাটি অনেকাংশে গল্পের শ্রোতার মতো।

'মানুষের সম্পর্ক' গল্পটিতেও এই আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে। এই গল্পেও উত্তম পুরুষের 'আমি', নিরঞ্জন এবং পতিত একটি আড্ডায় মিলিত হয়। আর গল্প শুরু হয় এইভাবে—

"কথাটা হচ্ছিল রক্তের সম্পর্ক কত গাঢ় এই নিয়ে। আমাদের মধ্যে নিরঞ্জন একটু সিনিক। ...পতিতের অভিজ্ঞতায় অনেক গল্প, আর সে বলতও বড় ভাল। পতিত রক্তের সম্পর্কের গাঢ়ত্বের কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই একটা মাত্রাতেই বাঁধা থাকবে আমার এমন মনে হচ্ছিল না। সেটা একটা বিচিত্র মানুষদের গল্প হয়ে উঠতে লাগল। আমরা সবাই পতিতের গল্পটা খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলাম।" [৮]

অতঃপর 'মানুষের সম্পর্ক' নামক মূল গল্পের সমস্তটাই পতিতের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়। পতিত মূল গল্পকথকের ভূমিকা পালন করে। আর গল্প শেষে ফের একবার উত্তম পুরুষের 'আমি', নিরঞ্জনকে আমরা খুঁজে পাই। গল্পের শেষাংশে তাই শুরুর গল্পকথক, উত্তম পুরুষের 'আমি' ফিরে আসে এভাবে—

"এভাবে পতিতকে আমি একটা ঠেকা দেওয়ার মত সমর্থন করলাম। কেননা পতিতের মত মানুষ যদি আরো কমে যায়, তাহলে পৃথিবী বসবাসের আরো অযোগ্য হয়ে যাবে। সে যাই হোক, পতিতের গল্পটা ছিল একটা পরিপূর্ণ মানবিক সম্পর্কের গল্প।" [৯]

'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পেও দুজন উত্তম পুরুষের বয়ান ব্যবহৃত হয়েছে। এ গল্পেও একজন কথক গল্প শুরু করে এভাবে—

> *"শিক্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে মেদিনীপুর যাচ্ছিলাম। হাওড়া স্টেশনে জড়ো হওয়া বিভিন্ন জেলার শিক্ষকদের মধ্যে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী অশোক-অনিমার সাথে দেখা হয়ে গেল। তারা এখন স্বামী-স্ত্রী।"*[১০]

হাওড়া স্টেশনে হঠাৎ একজন অশোক ও অনিমাকে প্রণাম করে, নিজেকে তাদের পূর্বজন্মের সন্তান বলে স্বীকার করলে গল্পশুরুর গল্পকথক যথেষ্ট আশ্চর্য হয়। তখন অশোক মূল গল্প শুরু করে। গল্প শুরুর আগের মৌতাতটি গল্পকথকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত হয় এভাবে—

> *"হাতে সময় অনেক ছিল। অশোক গল্প শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাওড়া স্টেশনের হাজার হাজার লোকের ব্যস্ততা, ক্রমাগত গাড়ির আসা যাওয়া, মাইক্রোফোনের দুর্বোধ্য নির্দেশ, হকার, পুলিশ, নিত্যযাত্রী, ভিখারি সব যেন ভোজবাজির মত আমার চোখের এবং কানের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। বাস্তব হয়ে উঠতে লাগল অশোকের গল্পের চরিত্রগুলো, সেইসব চরিত্রকে ধরে রেখেছে যে প্রকৃতি—নদী নালা আকাশ আর বাতাস।"*[১১]

ক্রমশ অশোক দায়িত্ব নেয় মূল গল্পটি বলার এবং 'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পটির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অশোককেই আমরা খুঁজে পাই। গল্প শুরুর কথক ধীরে ধীরে এই গল্পেও শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

অভিজিৎ সেন, কাজেই শুধুমাত্র 'অহং' বিসর্জনের জন্যই উত্তম পুরুষের বয়ানে লিখতে চাননা তা অনেকাংশে সত্যি হলেও আমরা দেখতে পাই, উত্তম পুরুষের বয়ান, বিশেষ করে যে সব গল্পে দুজন উত্তম পুরুষের কথক ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে বেশ কিছু আপাত স্পর্শকাতর বিষয়। আমরা খুঁজে পেয়েছি আপাত অলৌকিক কোনো ঘটনা। লোকবিশ্বাস জারিত কিছু মত ও বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গল্পগুলির মধ্যে। সেখানে প্রতিটি গল্প শুরুর কথক, পাঠকের মতোই শুধুমাত্র শ্রোতা বা ভবিষ্যৎ পড়ুয়ার ভূমিকা নিয়েছে। কাজেই, মূল গল্প যখন গল্পেরই অন্যতম একটি চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তখন, উত্তম পুরুষের 'আমি', বা প্রতিটি গল্প শুরুর গল্পকথক, বা অভিজিৎ সেনের নিজস্ব কোনো দায়ভার নেই গল্পগুলির বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে। ঠিক এজন্যই শুধুমাত্র একজন উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে লেখা গল্পগুলি, এমনকি দুজন উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে লেখা গল্পগুলিতেও অভিজিৎ সেন কোথাও 'পূর্ণ সর্বজ্ঞ' বা অনেকাংশে 'সম্পাদক সুলভ সর্বজ্ঞ' দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন নি।

কাহিনির প্রয়োজনে অভিজিৎ সেনের বেশিরভাগ গল্পেরই একটি পূর্বপট মূল গল্পের আবহকে গতি দান করেছে। গল্পের সংকট, সেই পূর্বপটের কোনো এক বা একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ আকস্মিক পরিণতি পেয়েছে। ফলে গল্পে, অনেক সময় কাহিনি অংশে নাটকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। 'দেবাংশী' গল্পের শুরুতে সেতু বর্মনের মধ্য দিয়ে এই নাটকীয়তা শুরু হয়ে অন্তে এই নাটকীয়তা বারুণীবালাকে কেন্দ্র করে পরিণতি পেতে শুরু করে, শেষ পর্যন্ত যা সারবান লোহারের অন্তিম পরিণতিকে ইঙ্গিতবহ করে তুলেছে। আবার সারবানের পরিণতি লুকিয়ে থাকে গল্পের একদম শুরুতে সারবানের শিশু বয়সেই, যখন বিরাম ও সামসেরের মধ্যে দেবাংশী বিষয়ক লড়াই-এর শুরু হয়েছিল। পুর্বপটের এই অস্তিত্ব 'বর্গক্ষেত্র', 'কাক' 'মানুষের পিছন দিক', 'দীঘি', 'ব্রাহ্মণ্য' ইত্যাদি গল্পেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

'বর্গক্ষেত্র' গল্পে তাই সুপ্রাচীন মাল সম্প্রদায়ের জোতদারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে দীর্ঘ দুই প্রজন্মের বিস্তৃত পরিচয়ে। ডাফা মাল থেকে শুরু হয়ে আস্তিক মালের প্রজন্ম পেরিয়ে পরশুরামের মালের আমলে সে আনুগত্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। আর সে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে পূর্ব প্রজন্মের অতিশয় আনুগত্যের কারণে। বর্গা কেন্দ্রিক এই সুদীর্ঘ গল্পের মূল প্রেক্ষাপটের আড়ালে তাই কখনোই ডাফা মাল ও আস্তিক মালের প্রশ্নহীন আনুগত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

'কাক' গল্পেও 'দাসমশায়'-এর যে গল্প বর্ণিত হয়েছে সেই গল্পের পিছনেও একটি পূর্ব প্রেক্ষাপট, দাঙ্গা বিধ্বস্ত এক দুর্নিবার পরিস্থিতি কাজ করে গেছে সমানে। বলা যেতে পারে, গল্পে উল্লিখিত দাসমশায়, মানিক ভাই, নাসির, জাহেদ, রাঙাদি সবার পরিণতির যে গল্প দেশভাগের বহু বছর পর আমরা জানতে পারি, তার পিছনের ইতিহাস বহু

বছর আগেই প্রোথিত ছিল গল্পের মধ্যেই। আর তাই শেষপর্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মান্ধ মুসলমান জাহেদের জন্ম রহস্য লুকিয়ে থাকে এক হিন্দু রমণীর মাতৃ জঠরে।

'মানুষের পিছন দিক' গল্পেও ঠিক জাহেদের বিপরীত প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই, গল্পের চরিত্র আনন্দের মধ্যে। যে আনন্দ ক্রমশ গোঁড়া ও ধর্মান্ধ হিন্দুতে পরিণত হয়। সেই আনন্দের পূর্ব প্রেক্ষিত হিসেবে উঠে আসে রাধিকার বক্তব্য—

> *"এরপর সে থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথা পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করল। এই চ্যাঙড়ার বাপ হইল পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরজনা খান মিলিটারির একজনা, আর সে একজনা যে কে তা আমিও কবার পারমো না!"* [১২]

অর্থাৎ আনন্দের জন্ম রহস্য অনাবৃত করার জন্যই মূল গল্পটি গড়ে উঠেছে।

'দীঘি' গল্পেও বহু প্রজন্মের এই দীর্ঘ সূত্রতাকেই গল্পের মূল প্রেক্ষাপট হিসেবে তুলে ধরেছেন অভিজিৎ সেন। লালন সাঁইয়ের 'জলের উপর পানি, না পানির উপর জল' এই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে। আর তাই জাতিতে মুসলমান খলিলুরদের দীঘির নাম কেন 'নীলু ঘোষালের দীঘি' তার ইতিহাসই বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পের দীর্ঘ পূর্বপট হিসেবে।

পূর্বপটের অস্তিত্ব 'ব্রাহ্মণ্য' গল্পেও প্রকারান্তরে বর্তমান। 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দ ও তার জাত্যাভিমানকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে ব্যবহার করার জন্য নচিকেতা ও কেতকীর জন্ম রহস্য গল্পে বিস্তার লাভ করেছে। আর সেটির পাশাপাশি মহাদেব ভৌমিক, তার স্ত্রী ও তার পরিবারের দেব-দ্বিজে ভক্তি গল্পটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেভাবে অভিজিৎ সেনের গল্পে ঠাঁই পেয়েছে, ঠিক সেভাবেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গেই গল্পের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু গল্পে চিঠির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'বর্গক্ষেত্র' গল্পে প্রথম চিঠির উল্লেখে গল্প শুরু হয়, বলা ভালো গল্প গতি লাভ করে আর দ্বিতীয় চিঠিতে এই গল্পের প্রথমার্ধের মুখ্য চরিত্র আস্তিক মালের মৃত্যু ঘটে, গল্পের সংকটকাল ঘনিয়ে উঠতে শুরু করে। দুই চিঠির বক্তব্য গল্পকে গতি দান করেছে একথা যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনই চিঠির মধ্য দিয়ে কাহিনি এবং চরিত্রের একটি সুস্পষ্ট বিন্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন অভিভিৎ সেন। দুটি চিঠির পারস্পরিক প্রয়োগ এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। প্রথম চিঠির বয়ান নিম্নরূপ—

> *"শ্রদ্ধেয় দাদা,*
> *জয়গুরু জানিবেন। বাবা আগামী ১৭ ফাল্গুন শনিবার বৈকালের মটরে কাশিয়ানি যাইবেন। জমিজমা সংক্রান্ত কিছু কাজকর্ম আছে। আপনি অথবা পরশুরাম যে কেহ একজন ঘোড়া লইয়া মটর-রাস্তায় হাজির থাকিবেন। আমরা কেহ সঙ্গে যাইতেছি না। বাবার শরীর বিশেষ ভালো যাইতেছে না, সেই কারণেই এই অগ্রিম সংবাদ প্রদান। আশা করি গুরুকৃপায় কুশলে আছেন। জয়গুরু—*
>
> *বিনয়"* [১৩]

উক্ত চিঠি থেকে কয়েকটি জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—শচীকান্তের আগমন বার্তা, শচীকান্তের ছেলে হিসেবে বিনয়ের পরিচয়, 'জয়গুরু' সম্বোধনে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, ঘোড়া নিয়ে অবস্থান করার নির্দেশে পরশুরামের আনুগত্য ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিটি শচীকান্ত ও তার পরিবারের ইচ্ছা, গোপনে জমি বিক্রির ঘটনা এবং কমবেশি প্রভুত্ব ফলানোর নির্দেশবাহী হয়ে ওঠে, জমিজমার হিসেবের ক্ষেত্রে, তার ভোগ দখলের ক্ষেত্রে ও পূর্ববর্তী বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে যে কারচুপি করা হয়েছিল, তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই চিঠিতেই। ঘটনার কালানুক্রমিক উল্লেখও দ্বিতীয় চিঠিতে পাওয়া যায়। যেমন, ফাল্গুনের ১৭ তারিখে শচীকান্তের আগমন এবং দ্বিতীয় চিঠিতে আমরা যে তারিখ পাই, তা হলো জ্যৈষ্ঠের ১০ তারিখ। অর্থাৎ ঘটনাক্রম যে তিনমাসের বেশি তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় চিঠিটির বয়ান এই রকম—

> *"শ্রদ্ধেয় দাদা,*

> *জয়গুরু জানিবেন। আশা করি গুরকৃপায় কুশলে আছেন। গত ১০ জ্যৈষ্ঠ শনিবার আমাদের দঃ কাশিয়ানি মৌজার ১০৭৮ ও ১০৭৯ দাগ দুইটি শ্রী রাখাল সরকারের নিকট বাবা বিক্রয় করিয়াছেন। খানাপুরি বুঝারতে যে দুখঃজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে আমরা কিংবা বাবা জমিজমা রাখা আর সুবিবেচনা মনে করিতেছি না, কেন না আপনি ও বাবা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছেন। আপনাদের অবর্তমানে জটিলতা বাড়িবে বই কমিবে না। বাকি দাগ দুইটি আপনারা আপাতত পূর্বেকার শর্তেই ভোগদখল করিতে থাকুন। আশা করি জমির দখল লইতে রাখাল বাবুর কোনো বেগ পাইতে হইবে না। জয়গুরু—*
>
> *বিনয়'*[১৪]

'ব্রাহ্মণ্য' গল্পেও এই রকমই চিঠির উল্লেখ পাওয়া যায়, যে চিঠি নচিকেতা ও কেতকীর মধ্যে প্রভাব ফেলে। ব্রাহ্মণের স্ত্রী হিসাবে কেতকীর যে পরিচয় তা নস্যাৎ করে দিতে চাওয়াই পত্রপ্রেরকের একমাত্র উদ্দেশ্য—

> *"একখানা চিঠি এসেছে কেতকীর নামে। খামের চিঠি। ...অচেনা পাকা হাতের লেখা। ...নচিকেতাকে সম্বোধন করে লেখা চিঠি অথচ ঠিকানায় কেতকীর নাম! জনৈক সন্তোষকুমার মিত্র যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করেছে যে নীলকমল ঘোষ যার কন্যাকে সে বিবাহ করেছে, আদেও বঙ্গীয় কায়স্থ কুলীন শ্রেষ্ঠ ঘোষ গোষ্ঠীর লোক নয়। এই ব্যক্তি পুর্বতন রাজশাহি জেলার পত্নীতলা থানার বোয়ালমারি গ্রামের সদগোপ বংশোদ্ভব।'*[১৫]

ঠিক এইরকম চিঠি দশ-বারো দিন আগে পেয়েছিল নচিকেতা। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, উক্ত গল্পে সংকটকাল ঘনিয়ে তুলতে চিঠিকে অনেকখানি আশ্রয়স্বরূপ স্বীকার করেছেন অভিজিৎ সেন।

বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ সেন তাঁর গল্পগুলি রচনা করেছেন—একথা সত্য মেনে নিয়ে আমরা বলতে পারি অনুপুঙ্খ বিবরণ রচনাতে অভিজিৎ সেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে Detailing-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেখানে চিঠির পাশাপাশি দলিল, আধি আইন, জমি রেকর্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, জমির অবস্থা, জমির দাগ নম্বর, মাঠ খসড়া রিপোর্ট প্রায় কোনো কিছুই বাদ দেননি লেখক। 'বর্গক্ষেত্র' গল্পে আমরা তাই একই সঙ্গে আধিয়ারি স্বত্ব নথিবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি জমির দাগ নম্বরের বিবরণ পাই এভাবে—

> *"মাঠ নেমে সরকারি লোক বলে, এই জমি কার? মৌজা দক্ষিণ কাশিয়ানি, দাগ—চোদ্দোর বাটা তিনশো ছাব্বিশ, তিনশো উনত্রিশ, তিনশো—*
> *কেউ একজন উঠে বলে, ই মাটি হামি আধি চষি।*
> *—তোমার নাম?*
> *—পাতি সা বম্মন।*
> *—মালিকের নাম?*
> *—গোপাল সরকার।*
> *—জমির পরিমাণ?*
> *—ই দাগে তিন বিঘা, উ দাগে আড়াই বিঘা আর উটা—*
> *আধিয়ারি স্বত্ব নথিবদ্ধ হয়। এইভাবেই হয়।'*[১৬]

দলিলের উল্লেখও এই গল্পে পাওয়া যায় এভাবে—

> *"—উক্ত জমাজমিতে আমার যে স্বত্ব-স্বামীত্ব ছিল তাহা অদ্য হইতে রহিত হইয়া তৎসমস্ত আপনার প্রতিবর্তিনী। আপনি উক্ত সম্পত্তিতে আমার যাবতীয় স্থায়ী স্বত্ববান ও মালিক দখলকার হইয়া জমিদার সেরেস্তায় চলিত নাম খারিজে নিজ নাম জারী করতঃ নির্ধারিত রাজস্বাদি আদায়ে দান বিক্রয়াদি যাবতীয় হস্তান্তর করণের ক্ষমতার সহিত পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশগণ ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকুন। তাহাতে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশগণ কাহারো কোনো ওজর চলিবে না, করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। উক্ত জোতজমা সম্পূর্ণ নির্দায় ও উন্মুক্ত অবস্থায় নিজ দখলে আছে। কাহারো নিকট দায়বদ্ধ বা হস্তান্তর আদি কোনো কার্য্য করি নাই, করিয়া থাকিলে প্রকাশ্যে আইনত দণ্ডনীয় হইবে।"* [১৭]

'আইন-শৃঙ্খলা' গল্পে টুইলার চাষের জমির অবস্থার বিবরণ পাই এভাবে—

> *"খর্বাকৃতি এই ধান গাছগুলো পাকতে শুরু করার পরেও পাশকাঠি ছাড়ে, কিন্তু জলের অভাবে এখানে সব রকম বৃদ্ধি বন্ধ। ...নদীর পাড়ের এই জমিগুলো প্রায় সবই আধি জমি। টুইলারা আধি স্বত্বে এগুলো আবাদ করত। এতদিন এখানে হতো পাট এবং সামান্য কিছু আমন ধান। ধানের থেকে পাটই লাভজনক। পলিতে নিড়ান খরচ লাগে কম, জল জমে থাকে না বলে সুবিধাও বটে ...তার পঞ্চাশ শতক বর্গা জমিতে আলুর গাছ একটা সবুজ দ্বীপের মতো অঘ্রাণের হাওয়া আর আলোয় ঝলমল করতে থাকল। পনেরো-বিশ টাকা খরচ করে সে সদর শহরের কাছাকাছি একটা অঞ্চলে দেখে আসে আলুর মধ্যে মিশ্র-চাষ হিসাবে পটলের লতাও বসানো যায়। দুঃসাহসী টুইলা পটলের লতাও বসালো সারি সারি।"*[১৮]

পাশাপাশি 'সীমান্ত', 'বদলি জোয়ানের বিবি', 'সাইদার এখন-তখন' ইত্যাদি গল্পে সীমান্ত সংক্রান্ত বহুবিধ খতিয়ান ও নির্দেশ আমাদের চোখে পড়ে।

চিঠির পাশাপাশি গান ও কবিতার ব্যবহারও অভিজিৎ সেনের বেশ কিছু গল্পে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পে মনসার ভাসান গান দীর্ঘ সময় ধরে গল্পে এক সুনির্দিষ্ট আবহ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাপে কাটা এক শবদেহকে যখন কমল সাধু আর তার অনুগতরা বাঁচানোর চেষ্টা করে, তখন এই গান ঘুরে ফিরে সেই অলৌকিক পরিবেশকে আরও অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই শেষপর্যন্ত অশোকও 'আরে চিয়াও না আরে হে—/চিয়াও চিয়াও, চান্দর পুত্রেরে/ডংক চিয়াও চিয়াও' এই গানের সঙ্গে যখন ধুয়া পদ হিসাবে 'জলে ভাসিল রে ও মোর নয়নের তারা—ভাসিল রে' গীত হয় তখন সে-ও এক অন্যরকম অনুভবের সাক্ষী হয়ে ওঠে। কমল সাধুর এসব কর্মকাণ্ডে সে সামিল না হলেও, এই গানের টানে সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অশোকের তৎকালীন মনের অবস্থা বোঝাতে এই গান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন। আমরা অশোককে খুঁজে পাই, সেই নদীর পাড়ে এইভাবে— "গায়কদের "জলে ভাসিল রে ও মোর নয়নের তারা—ভাসিল রে—"র ধুয়া মেঘলা বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে যেন আমাকে লক্ষ্য করেই ধেয়ে আসতে লাগল। আমি যেন সেই নদী পাড়ে, সে অনৈসর্গিক পরিমণ্ডলে একেবারে বন্দী হয়ে গেলাম। আহারে—কাদের নয়নের তারা এভাবে সুসজ্জিত হয়ে ভেসে এসেছে এত বড় জলপথ। ...অন্ধকারের ভিতরের চারদিকের বাড়িঘর, গাছপালা ছুঁয়ে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বাতাসের আর্দ্রতা মেখে, আরো আরো দূরের গ্রাম জনপদের দিকে *"নয়নের তারা ভাসিল রে" ছড়িয়ে যাচ্ছে। জগতের যত হতাশা, কান্না আর ব্যথা, যত হাহাকার, না পাওয়া এবং আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক, আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক যত সব দুঃখ আর শঙ্কা, জগতের যত অমঙ্গল—এইসব কিছু থেকে রেহাই পাবার জন্য এই নিসর্গ যেন এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছে।"*[১৯] 'ক্ষেত্রপাল' গল্পেও লখিন্দরের বাসরঘর প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে শিলদারের আবৃত্তির মাধ্যমে।

'দেবাংশী' গল্পেও ঠিক এভাবেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ এক অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে বিষহরির নির্দিষ্ট থানে। সেখানেও বিষহরির বন্দনা গায় বিরাম। বিষহরির বন্দনা অংশ তিন পাক ঘুরে বিরাম গায়—

> *"একখানি পুষ্কনি চারিখানি ঘাট,*
> *তাহাতে জন্মিল পদ্দমেরই পাত্।*
> *পদ্দম লয়, পদ্দম লয়, পদ্দমকুমোরী*
> *বাপ মাও নাম তুলে জয় বিষহরি—"*[২০]

আবার সেতু বর্মণ যখন দেবাংশী সারবান লোহারের কাছে জোতদার দৈত্যারি কর্তৃক জমির জবরদখল নিয়ে বিচার চাইতে আসে, তখন দেবাংশী সারবান লোহারও উবু হয়ে বসা সেতুর মাথায় হাত দিয়ে এক চিরাচরিত সুরে মন্ত্র আওড়ায়—

> *"উজিল বসোমতি, উজিল ধম্মো,*
> *যাহাতে হইল বিষবাণ জম্মো।*

বিষবাণ বিষটান, পাতার কলিজাহান,
ধিকি ধিকি করে বাণ অগ্নিসমান।
অগ্নিতে জ্বলে বাণ বাহির অন্তর
জিবলির অঙ্গ কাঁপে থর থর।
মাছরাঙ্গা খাইয়ে কাঁটা ঝাড়িয়ে ফেলে কাঁটা,
উঠ্ উঠ্ জারা বিষ কালো কালো ফোঁটা।
উঠ্ বিষ হাড়ে, উঠ্ বিষ নাড়ে,
উঠ্ বিষ শত্তুরের বত্তিশ মোকামপুরে।।'[২১]

আর এই মন্ত্র শুনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেতু বর্মণ, স্তব্ধ হয়েছিল অন্য সব মানুষ। বস্তুত এই মন্ত্রের মাধ্যমেই দেবাংশী সরাসরি, কিছুটা নিজের অজান্তেই দৈত্যারির বিরুদ্ধে একক শক্তি হিসাবে প্রতিস্পর্ধী ভূমিকা গ্রহণ করে। ঠিক একই আচার ও বিশ্বাসের মন্ত্র 'ডাইন' গল্পে নয়ন হাড়ি সন্তান শোকে উন্মাদিনী দালির সামনে উন্মত্তের মতো আওড়ায় এভাবে—

"আউর গাছি গুয়া তার চিরল চিরল পাত্
মুই কন্যা গুয়া আনিনু বজ্রাঘাত।
গুয়া পানেৎ আনাগিনী,
গুয়ার উপর চড়িয়া আসিল চৌষট্ ডাকিনী।'[২২]

'স্ফিংকস' গল্পেও সুরঞ্জন শুধুমাত্র মদের নেশাতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে না, মদের পাশাপাশি প্রতিমা বড়ুয়ার গোয়াল পাড়ার গানও তাকে আকৃষ্ট করে। গল্পের মূল কাহিনি, যা আমরা সুরঞ্জনের মুখ থেকে শুনি, তা শুরু হওয়ার আগের পরিবেশটি তৈরি করতে সুরার পাশাপাশি এই সুরেরও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত 'যদি বন্ধু যাবার চাও ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে' গানটির সূত্র ধরেই সুরঞ্জন গল্প শুরু করে। আর গল্পের শেষে তাই আবারও ধ্বনিত হয়ে ওঠে প্রতিমা বড়ুয়ার সুরেলা কণ্ঠ—"সুরঞ্জন তার কথা বন্ধ করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, আমি উঠে যন্ত্রটার কাছে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্যাসেটটা বের করে যথাস্থানে রাখলাম। পাশের গোয়াল পাড়ার গানের একটা ক্যাসেট ছিল। আমি ক্যাসেটখানা যন্ত্রে চাপালাম। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রতিমা বড়ুয়ার অনবদ্য কণ্ঠ ঝংকার দিয়ে উঠল—

মরি হে মরি হে মরি হে শ্যাম
শয়নে স্বপনে তোমার নাম—'[২৩]

আবার 'দেহাত্মতত্ত্ব' গল্পে গল্পকথক, বাউল আখড়ায় গেয়ে ওঠে 'আমার গোঁসাই বিনে দরদি কাঁয় আছে, কাও নাই কাও নাই রে'। এই গল্পেই সোনামণি দাসীর কণ্ঠে গীত হয় গল্পকথকের শেখানো লালন সাঁইয়ের গান 'আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে এক রূপের বাতি—এ বড় আজব কুদরতি।' বস্তুত লালন সাঁইয়ের এই গানই 'দেহাত্মতত্ত্ব' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে সোনামণি দাসীর জীবনে।

'বর্গক্ষেত্র' গল্পে চক্রান্তকারিণী সুশীলা, সারিকে যখন সেখানকার পুলিশের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তার আগে সুশীলা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে, সারির চিবুক ধরে, নিজের শরীরে হিল্লোল তুলে অর্থপূর্ণ চটুল গান গায়। বৈশাখ ও সারির সাংসারিক অভাবকে প্রকট করে তুলতেই সুশীলার এই গান অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুশীলা 'নীলদর্পণ' নাটকের পদী ময়রানীকে মনে করিয়ে দেয় অনেকাংশে। সুশীলা গায়—

"নাক ডাংরার ব্যাটাটা চক্ষু ফড়্কার নাতিটা
মোক্ ভুলালু শতের খাড়ু দিয়া।
তখনও না কইছং তুই রে—
মোটা চাউল খাই না, সরু চাউলের নেখায় জোখায় নাই?

বাড়ি গিয়া দেখোং মুই, চতুরালি করলু তুই,
ঘরোত্ কিনা খুদি কুড়াও নাই।"[২৪]

গানের পাশাপাশি কাহিনি বিন্যাসে অভিজিৎ সেন দু-একটি ছোটগল্পে কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, 'বর্গক্ষেত্র' গল্পে তারাপদর সামনে শশাঙ্ক নিজের লেখা যে দীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করে, সে কবিতার একদিকে যেমন থাকে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের অযাচিত প্রত্যাশার অন্যায্য দাবি, ঠিক তেমনই ফুটে ওঠে শশাঙ্কের মতো, তারাপদর মতো একনিষ্ঠ সৎ রাজনৈতিক কর্মীর সামান্য প্রাপ্তি ও তীব্র হতাশা। দীর্ঘ কবিতাটির প্রথমাংশ শেষ হওয়ার পর শশাঙ্ক শ্লেষের লঘু ভঙ্গিতে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ঝুলিখানি যেন উপুড় করে দেয় আর চিনিয়ে তৎকালীন শ্রেণিসংগ্রামের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ঘুণপোকাটিকে। শশাঙ্ক আবৃত্তি করে—

"আমার জন্য রাখলে তোমার ইচ্ছাখানা,
শুয়োর পোষা, ছাগল পোষা,
কুটিরশিল্প, মহান বাণী।
ভোটের বাক্স—
অচিরেই হাতে দেবে স্বর্গ আনি।
আমি যাব নেংটি পরে চামড়া কলে,
খনির নীচে গ্যাসের বিষে উদোম গায়ে।
হাওয়া উঠলে তোমার পালে।
উজান হলে আমার শুধু
গুণই টানা
গুণই টানা।"[২৫]

এসবের পাশাপাশি কাহিনি বর্ণনে অভিজিৎ সেনের অনুপুঙ্খ বিবরণ গল্পগুলিতে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। 'দেবাংশী' গল্পে খেরা খেলার থানের বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে—

> *"বিষহরি থানের সামনে গোবর-লেপা খেরার চৌহদ্দি। মাঝখানে নিটোল একটা কলাগাছের গোড়া শক্ত করে মাটির মধ্যে বসানো। চারপাশে বাঁশের খুঁটি, লাল সুতোয় আমপাতার ঝালর। কলাগাছের সামনে ফুলপল্লবে সজ্জিত ঘট। সোলার ফুল, মাটির পঞ্চনাগ, অষ্টনাগ। টুকরো টুকরো পটে লখীন্দরের মহাযাত্রা, নেতা ধোপানি, মাছ-কুটনি স্ত্রী লোকের সারি এবং এ-সবের উপরে মনসার মুখ, তারও উপরে সাপের মুকুট। মাটির সরায় ধূপ, সিঁদুর, পাতি গাছের মুথো, কালো কচুর গাছ, পাটের সবুজ চারা।"*[২৬]

'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পে ভাসমান মান্দাসের অনুপুঙ্খ বিবরণ ফিরে ফিরে আসে এভাবে—

> *"নদীর পাড় থেকে অন্তত হাত পনেরো দূরে একখানা কলার ভেলা নদীতে পোঁতা একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা। খুব সুন্দর করে সাজানো বড়সড় একখানা ভেলা। দূরের থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কচি কলার গাছ কেটে একটার উপরে আর একটা এরকম ডাবল করে বাঁশে গেঁথে এই ভেলা তৈরী করা হয়েছে। ভেলার চারদিক ঘিরে সোলা, কাগজ এবং কাপড়ের চিত্রময় প্যানেল। রঙিন কাগজের শিকল এবং নিশানে সেজে ভেলা খানা ঝলমল করছিল। ভেলা খানা খুঁটিকে কেন্দ্র করে হাওয়া এবং ঢেউয়ের দোলায় ক্রমাগত ঘুরছিল। প্যানেলে গ্রাম্য পটুয়ার হাতে আঁকা ছবি বা পট। বাঁটি পায়ের নিচে রেখে সারি দিয়ে বসা মাছ কুটনি স্ত্রী লোকদের উপরে ছিপ ধরে নদীর পাড়ে বসে থাকা গোদা, যার ছিপে আটকেছে বিরাট মাছ। তারও উপরে হংসাসনা, অষ্টনাগ-মুকুট ভূষিতা দেবী বিষহরি।"*[২৭]

হাওয়া এবং জলের টানে ভেলা ঘুরতেই, তাতে দেখা যায় অন্য চিত্র—

> *"লোহার বাসরের ঘরের অভ্যন্তরের দৃশ্য। লখাই সর্পাঘাতে মুমূর্ষু। সনকা এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা পাখা, জলের ঝারি ইত্যাদি নিয়ে তাকে পরিচর্যারত। একপাশে বেহুলা। সাপ যত্রতত্র, ফণী এবং ফণা বিহীন, চিত্রবিচিত্র। এর উপরের প্যানেলে লখিন্দর কলার ভেলায় ভেসে যাচ্ছে। সবার উপরে পূর্বানুরূপ অষ্টনাগ ভূষিতা হংসাসনা দেবী। ভেলার সাথে ও পায়ের দিকে চিত্রে দেবী দাঁড়িয়ে। হলুদ, সবুজ, লাল এবং নীল রঙ চড়া ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে পটে। একেবারে নিচের দিকে ছবি এবং ভেলার মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেখান থেকে একটি স্ত্রী লোকের মুখের একপাশ, চুল, একজোড়া আলতা মাখা পায়ের অস্তিত্ব স্পষ্ট দৃশ্যমান।"*[২৮]

অভিজিৎ সেনের এই অনুপুঙ্খ বর্ণনা অনেকাংশে ছায়াছবির দৃশ্য নির্মাণের মতো, বলা ভালো চিত্রনাট্যের মতো হয়ে ওঠে অনেক জায়গায়। 'মানবদেহের গৌরব' গল্পের শেষাংশ আমাদের এই বক্তব্যকেই প্রমাণ করে। শেষাংশে তাই অভিজিৎ সেন গল্প লিখতে লিখতেই আমাদের দেখিয়ে দেন—

> *"ঘরের ঠিক মাঝখানে সুলেখা একটা পুটুলির মতো হয়ে বসে ছিল যেমন ভাবে বিকলাঙ্গ ভিখারিরা বসে থাকে। তাকে দেখাচ্ছিলও বিকলাঙ্গ বালকের মতো। তার সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে, মাথার চুলও। গায়ে কোথাও কালো কার্বনের ছোপ, কোথাও সাদাটে পাউডারের। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সে। শুধু তার মুখটা অবিকৃত। সে রেবার দিকে তাকিয়ে জন্তুর মতো বসেছিল। রেবার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে উঠল, 'হাঁ—করে দেখছিস কী? আলনা থেকে একটা কাপড় দে!' তার জীবনের যেন একটা কাজই বাকি ছিল। আলনা থেকে একটা কাপড় তুলে রেবা কোনও মতে তার গায়ের উপরে ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।"*[২৯]

ছায়াছবির এই দৃশ্য নির্মাণের মতোই গড়ে ওঠে 'রহমতের ফেরেশতা' গল্পের শুরুর অংশটি এভাবে—

> *"ঘুম ভেঙে যাবার পর শাবি প্রথমে স্থির করতে পারল না যে সে কোথায় আছে। একটু পরে সে অবশ্য বুঝল যে সে ঘরেই আছে।*
> *কিন্তু ঘর যেন ঘর নয়।*
> *নীল আলোয় ঘরখানা অপরূপ হয়ে উঠেছে।*
> *আর ভারি শীতল এবং সুগন্ধী চারপাশ।*
> *ঘরের তিন ভাগের দুভাগ ছেড়ে বাকি এক অংশে আড়াআড়ি কাপড় টাঙানো।*
> *সে সেই কাপড় খানা দেখে পাশে শুয়ে থাকা তার ঘুমন্ত স্বামী মাসুদের দিকে তাকাল।*
> *নীল মিহি গুঁড়ো গুঁড়ো আলো ছড়াচ্ছে শাড়ি খানা।*
> *সেই আলো ফের ছড়িয়ে পড়ছে মাসুদের মুখে।*
> *ঘুমের মধ্যে তার নিরীহ লম্বাটে মুখখানা এখন ভারি মোহময়। ভারি করুণ।"*[৩০]

'মাটির বাড়ি' গল্পেও এই দৃশ্য নির্মাণ আকৃষ্ট করে আমাদের। চিত্রনাট্যের আভাস পাওয়া যায় এভাবে—

> *"অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। একটা মাত্র দরজা। জানালার মতো একটা ফোকর আছে উপরের দিকে। সেই ফোকর দিয়েই সামান্য আলো আসছে।*
> *গোহিলাল সেই ঘরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। একটা তক্তপোষের উপর প্রচুর অগোছালো এবং নোংরা কাঁথা। আর বালিশ অথবা বালিশের মতো দেখতে অথচ বেশ শক্ত একধরনের বস্তু। ওইসব বালিশের ঠেকা দিয়ে গোহিলালের ঊর্ধাঙ্গ খানিকটা সোজা রাখার চেষ্টা হয়েছে। গোহিলালের চেহারায় মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ প্রকট, কিন্তু তার চেতনা এবং বিচারবুদ্ধি এখনও বেশ পরিষ্কার। এখন তার চোখের দৃষ্টি অনির্দিষ্ট কিন্তু ক্রুদ্ধ।*
> *বাইরে বেরোবার দরজার সামনে ভিতরের দিকে গোহিলালের বড় ছেলে ভামর দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে, বাপের ক্রুদ্ধ চোখের দিকে নয়। ঘরের ভেতরে আরেকজন মানুষও আছে। যৌবন এখনও যায়নি এমন একজন স্ত্রীলোক গোহিলালের পায়ের কাছে তক্তপোষের উপরই বসে আছে। তার নাম কামশোরী বা কামেশ্বরী।"*[৩১]

ফলে কাহিনি বিন্যাস রীতিতে অভিজিৎ সেন আশ্রয় করেছেন সাহিত্য শিল্পরূপ ও রীতির একাধিক উপকরণকে। ফলে কমবেশি একই বিষয় নিয়ে লিখলেও, বক্তব্য প্রকাশে কখনও কখনও তীব্র রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা পেলেও, কখনোই সেগুলিকে আরোপিত বলা চলে না। নিজস্ব গল্পরীতিতে সাংবাদিকের জোব্বা থেকে ভাষ্যকারের আংরাখা, এমনকি চলচ্চিত্র নির্দেশকের মতো চিত্রনাট্যধর্মী কাহিনি বিন্যাসেও অভিজিৎ সেন তার গল্পগুলিকে সচল রাখেন। তার ফলে প্রতিটি গল্পের পরিণাম, নামকরণ থেকে শুরু করে গল্পের শেষ যতিচিহ্নটি পর্যন্ত অর্থবহ হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রাবণী পাল (সং), 'পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা- ০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৯ জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৫।
২. অভিজিৎ সেন, 'গল্প বিষয়ে ভাবনা চিন্তা', বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), 'কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে', সোপান, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৮, কলকাতা- ০৬, পৃষ্ঠা– ৪৩।
৩. অভিজিৎ সেন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা- ২৮।
৪. অভিজিৎ সেন, 'কি লিখি — কেন লিখি', বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), 'কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে', সোপান, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৮, কলকাতা- ০৬, পৃষ্ঠা– ৪০।
৫. অভিজিৎ সেন, 'পঞ্চাশটি গল্প', সুবর্ণরেখা, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৬৭।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭১।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৯।
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৮৪।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯৮।
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০৪।
১৩. অভিজিৎ সেন, 'দশটি উপন্যাস', কলকাতা- ০২, প্রথম প্রকাশ- ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৮৩।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৮৯।
১৫. অভিজিৎ সেন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা- ২৩০।
১৬. অভিজিৎ সেন, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা- ০২, প্রথম প্রকাশ- ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৮৫।
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮০৯।
১৮. অভিজিৎ সেন, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ- ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫০।
১৯. অভিজিৎ সেন, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৭০।
২০. অভিজিৎ সেন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩২।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫।

২২. অভিজিৎ সেন, 'পঞ্চাশটি গল্প', সুবর্ণরেখা, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃষ্ঠা- ৬০০।
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮৯।
২৪. অভিজিৎ সেন, 'দশটি উপন্যাস', প্রতিভাস, কলকাতা- ০২, প্রথম প্রকাশ- ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৯৪।
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৮০৩।
২৬. অভিজিৎ সেন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৩০।
২৭. অভিজিৎ সেন, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৬৮।
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬৮।
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২১।
৩০. অভিজিৎ সেন, 'পঞ্চাশটি গল্প', সুবর্ণরেখা, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃষ্ঠা- ৫৭১।
৩১. অভিজিৎ সেন, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫০।